লোক সংস্কৃতি
আশ্বিন ১৪১৩, সেপ্টেম্বর ০৬
সম্পাদক - দুলাল চৌধুরী
আকাদেমি অব ফোকলোর
পি ১৬২ যাবদপুর বি(বিদ্যালয় সমবায় আবাসন
কলকাতা ৭০০০৯৪, ফোন - ৫৫১৪৪৫০৯

।। সূচীপত্র।।
কলিকাতা - যাদুবিন্দু
কুমোরটুলি - তাপস ঘোষ
কলিকাতা - মুকুন্দরাম চত্র(বর্তী
কৃষ(রাম দাস
রূপচাঁদ প(ী (দাস)
লোকসংস্কৃতি ঃ জিতেন মিত্র
দুর্গা - দুলাল চৌধুরী

কুমোরটুলির প্রতিমা শিল্প

তাপস ঘোষ

সমাজের জনসাধারণের রূপচেতনার অবারিত আত্মপ্রকাশকেই লোকশিল্প বলে। অনায়াস পটুত্বই এর বিশেষত্ব। ফলে গ্রাম্য পরিবেশে প্রতিপালিত মানুষের কথাই স্বাভাবিক কারণে এসে যায়। চিত্র, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য এই তিনভাবে লোকশিল্পের আত্মপ্রকাশ ঘটতে পারে

লোকাশ্রিত শিল্পধারায় মৃৎশিল্প একটি গু(ত্বপূর্ণ অধ্যায়। এর প্রাচীনত্ব সর্বাধিক। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সভ্যতা বিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনায় মৃৎশিল্পের উপাদানগুলি গু(ত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়।

মানুষ বনাম প্রকৃতির সম্পর্কের বৈপ-বিক পরিবর্তন ঘটে আজ থেকে প্রায় দশ হাজার বৎসর আগে নব্য প্রস্তর যুগে। যখন মানুষ চাষ - বাস করে প্রথম নিজের খাদ্য উৎপাদন করতে শিখল শুধু খাদ্য নয় মানুষ বুদ্ধিবলে প্রকৃতিকে জয় করার সাথে সাথে আরো অনেক জিনিস উৎপাদন ও সৃজন করতে শিখল। তার মধ্যে মৃৎশিল্পের নির্দশন প্রধান। প্রকৃতির অফুরন্ত উপাদান যে মাটি তার জলীয় পদার্থ তাপ দ্বারা নিষ্কাশিত করে যে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটানো হল তার ফলে বিকাশ হল মৃৎশিল্পের। মাটির প্রধান উপাদান /হাইড্রোটেড অ্যালুমিনিয়ম্ সিলিকেট্ -নিয়মিত তাপ সহযোগে অনার্দ্রীকরণ ও নমনীয়তা হরণ, বেশ একটা বড় রকমের টেকনোলজিক্যাল বিপ-ব। প্রত্নতাত্ত্বিক ও নৃতত্ত্ববিদদের মতে এই মৃৎশিল্প বিপ-বের প্রধান নায়ক অথবা নায়িকা হলেন কৃষক পত্নী ও কৃষক কন্যারা।

মাটি দিয়ে গড়া এই প্রতিমাগুলিকে আঙুলের টিপে নাক, কান, চোখ, ঠোঁট নোখ বা ন(ে দিয়ে আঁচড় কেটে চিহ্নি(ত করা হয়। অথবা মাটির ঢেলা বসিয়ে মানানসই দেহাবয়ব গঠন করা হয়। প্রাচীন সভ্যতার প্রধানকেন্দ্রগুলি মিশর, মেসোপটেমিয়া, সিন্ধুসভ্যতা, মধ্যআমেরিকা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে নগ্নিকাপুতুল /ভেনাস ফিগারইন -এর নিদর্শন পাওয়া গেছে।

অলৌকিকতায় আস্থাশীল জাদু বি(াস থেকে প্রজননকেন্দ্রিক জাদু বি(াস অথবা ধর্মীয় আচার পালন, শিশুর ত্রীড়া, ছলন দেবার ধারণা সবই মূর্তি গড়ার প্রেরণা বলা চলে। মৃৎশিল্পগুলিকে বিবর্তন মাফিক অঞ্চল ও কাল ভেদে বিন্যাস করা আজও সম্ভব হয় নি। তবে লোকশিল্পের অন্তর্গত মৃৎশিল্পধারার মোটিফ, সেই হোসাঙ্গাবাদ ভীমবেটকা মিনোয়ান বি, ইস্টার দ্বীপ যাই হোক না কেন, রূপকল্পের দিক থেকে মাতৃতান্ত্রিক সংস্কার ও সার্বজনীনতা জনিত মিল সুনির্দ্দিষ্ট। প্রত্নতাত্ত্বিকরা তাই এদের নাম দিয়েছেন -/জেলেস ডলস্*। এর প্রধান কারণ হিসাবে বলা যায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের বিভিন্নতা, সে অঞ্চলের স্বতন্ত্র মৃৎশিল্পের সৃষ্টি করেছিল। ধীরে ধীরে উপাদানের ব্যবহার ও প্রয়োগরীতির ত্র(মোন্নতি ঘটেছে। ফলে আকারে প্রকারে মৃৎশিল্পের আঙ্গিক, ডিজাইন ও কা(কুশলতার উন্নতি হয়। এবং মৃৎশিল্প বংশগত পারদর্শিতানির্ভর বিশিষ্ট কা(শিল্পে ও লোকশিল্পে পরিণত হয়। সমাজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত(উৎপাদন যখন সম্ভব হয় মৃৎশিল্পীরা তখন আত্মনির্ভর কৌশলী কা(শিল্পীতে পর্যবসিত হন। এ সম্পর্কে আরো একটি কথা বলা প্রয়োজন। মৃৎশিল্পীদের প(যাযাবর হওয়া সম্ভব। কারণ মাটি খুব সরল ও সহজলভ্য। চলমান মৃৎশিল্পী তাই পৃথিবীর বহুদেশে দেখা যায়। স্থানান্তরে লোকের চাহিদা মেটাতে তারা যন্ত্রপাতি নিয়ে ভ্রমণ করে।

লোকায়ত শিল্পধারা ভারতীয় জনসাধারণের জীবনরসের প্রতিচ্ছবি। এই শিল্পধারার বিবর্তনের ইতিহাসের প্রতি স্তরেই তা সুস্পষ্ট। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে গুপ্ত যুগ পর্যন্ত একটি সর্বভারতীয় শৈলী ধারা ও আদর্শ অনুসরণের সাধনা চলে আসছিল। এর পরেই (গুপ্তযুগ) তার বিলুপ্তি ঘটে। নিম্নধৃত ছক্ বি(-ষণ করে দেখানো যায় রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে তার রেখে মৃৎশিল্প ধারাটি লোকায়ত জীবনের সঙ্গে নিলেমিশে প্রবহমান ছিল। কখনও দরবারী শিল্পের প্রভাবে এই ধারাটি মৃতপ্রায় হয়েছে। আবার কখনও সুযোগ পেয়ে দু'কূল ছাপিয়ে ভীমবেগে আত্মপ্রকাশ করেছে। মূর্তিশিল্পের গঠনশৈলী, অলংকরণ ও প্রকাশভঙ্গির গতি ও প্রকৃতি সময়ের বন্ধনে আবদ্ধ থাকেনি। তাই গুপ্তযুগের পরেই প্রাদেশিক ভাবধারা ও আঞ্চলিক শিল্পশৈলী এবং আদর্শের অভ্যুদয় সূচিত হয়।

কালানুত্র(মে	প্রাপ্ত অঞ্চল	বিষয়বস্তু	বৈশিষ্ট্য
প্রাগৈতিহাসিক	ভারতের উত্তর ও দ(িণ অঞ্চল কুলি মোঘ প্রভৃতি স্থান	মাতৃকা, পশু, মানুষ জীবজন্তু, ব্যবহার্য দ্রব্য সামগ্রী (রোদে শুকনো অথবা পোড়ানো)।	অলঙ্করণ প্রাচুর্য, পরিপূর্ণ স্তন, সম্পূর্ণ গোলাকর চ(দ্বয়, উচ্চ মস্তকাভরণ।
তাম্র প্রস্তর ও লৌহ যুগ	মহেঞ্জোদরো, হরপ্পা, লোথাল, নীলগিরি, নাদুপেট্টা	মাতৃকা, পশু, শিশুর খেলনা, স্ত্রীলোকের গয়না।	অধিকাংশ নগ্ন, কেবল কোমরে একটি করে অলঙ্কার জড়ানো, মস্তকত্রিকোণ, গতিভঙ্গিমা প্রশংসনীয়। পোড়ানো নয়।

কালানুত্র(ম	প্রাপ্ত অঞ্চল	বিষয়বস্তু	বৈশিষ্ট্য
হরপ্পা পরবর্তী প্রাকমৌর্যকাল। মৌর্যযুগ	উজ্জয়িনীর কারথ, নাডদা তেলী, পুরনার ইনামগাঁত চান্দেলী।	পশুমূর্তি, স্ত্রী ও পু(ষমূর্তি	
	পাটনা, বকশাল, নালন্দা, তমলুক, গোকর্ণ	খেলনা ও শিশু, মাতৃমূর্তি	কমনীয়তা লালিত্য সহজ গতিছন্দ(লোকশিল্পের প্রকৃত বৈশিষ্ট্যযুক) খেলনার কালো রঙ করা হত। পশ্চিম এশিয়ার প্রবাব দেখা যায়।
মৌর্য পরবর্তী যুগ সুঙ্গ ও কাম্ফ যুগ, সাতবাহন	তমলুক, বানগড়, চন্দ্রকেতুগড় দ(িণ ২৪ পরগণা, সাঁচী ভা(ত ও বুদ্ধগয়া	দেবদেবী, নারীমূর্তি খেলনা ও পশুমূর্তি	লোকায়ত শিল্পরূপ বিন্যাসের সার্থক প্রকাশ
কুষাণযুগ	মথুরা	স্ত্রীমূর্তি ও প(ী মূর্তি	পূর্ণ যৌবনশ্রী, মৃৎশিল্পীরা অপে(াকৃত ীণ। গ্রীক ও রোমান প্রভাব।
গুপ্তযুগ	বিভিন্ন অঞ্চলের মন্দির গাত্র। বিকানীর ও জাদুঘরে র(িত নিদর্শন।	দেবদেবী ও মিথুন মূর্তি, পৌরাণিক সামাজিকচিত্র, কৌতুককর ঘটনা	পৌরাণিক অনুষঙ্গ। রঙের ব্যবহারের সূচনা
গুপ্ত পরবর্তী চলমান যুগ (বর্তমান অবধি)	বিভিন্ন অঞ্চল ভিত্তিক নিদর্শন	মৃৎপাত্র, খেলনা, মন্দির গাত্রের নিদর্শন ইত্যাদি	লোকশিল্পের চূড়ান্ত প্রকাশ। (এজলেস টাইপ)

প্রাদেশিক ভাবধারা ও আঞ্চলিক শিল্পশৈলী আদর্শ নিয়েই বাংলার মৃৎশিল্পের যাত্রা শু(। এগুলির সহজ ছন্দ নৃত্যতাল মাটির পুতুল দেবদেবীর মূর্তি ও ব্যবহারিক দ্রব্যাদির মধ্যে দেখা গেল। পাল রাজাদের আমলে মার্গ ও লোকসংস্কৃতির উভয়বিধ মিশ্রণ ও সমন্বয়ে বাংলার নিজস্ব আঞ্চলিক সংস্কৃতির উদ্ভব। টেরাকোটার রূপসৃষ্টি ও আঙ্গি কে যার প্রকাশ দেখা গেল।

টেরাকোটার চিত্রিত সমাজজীবন ও জীবিকা প্রদর্শন এবং মৃৎশিল্পীর ভ্রাম্যমানতা এই দুই সূত্র ধরেই হয়তো পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের মৃৎশিল্পীরা কলকাতায় উপস্থিত হয়েছিল। কালীঘাটের পটে সমাজের ব্যঙ্গচিত্রে যার অন্যতম প্রকাশ। আজও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মৃৎশিল্পীরা পুতুল প্রদর্শনীর আয়োজন করে থাকে।

বাংলার অন্যান্য মৃৎশিল্পকেন্দ্রগুলি যেমন বাঁকুড়ার পাঁচমুড়া, সোনামুখী, বহরমপুর, কাঁঠালিয়া, জয়নগর, বীরভূম, শ্রীরামপুর, চুঁচুড়া, দাঁইহাট, নতুনগ্রাম, কাটোয়া, পঞ্চকোট কৃষ(নগর প্রভৃতি স্থানগুলি গঠনরীতি ও শৈলীর দিক থেকে স্বতন্ত্র। এদের মধ্যে দুটি বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নি(ত করা চলে)

১. ভাবপ্রবণ মৃৎশিল্প (Abstract) বাঁকুড়া

২. বস্তুপ্রধান মৃৎশিল্প (Representation) কৃষ(নগর

এই দুই রীতির মধ্যে কুমারটুলি অঞ্চলে মৃৎশিল্পের মধ্যে বাস্তবানুকরণ রীতির ঝোঁক দেখা গেলেও পুরোপুরি চিহ্নি(তকরণ সম্ভব নয়।

হুগলী নদীর তীরে উত্তর কলকাতার কুমারটুলি মৃৎপ্রতিমা শিল্পের একটি গু(ত্বপূর্ণ অঞ্চল। কলকাতা নগরীর প্রাচীন ইতিহাস থেকে জানা যায় জব চার্ণকের আগের থেকেই এখানে শেঠবসাক প্রমুখ ভারতীয় বণিক স্থায়ীভাবে বসবাস শু(করেছিল। মোঘল বাদশাহের নিযুক্ত(হিন্দু রাজস্ব গ্রহণকারীরাও এই অঞ্চলের বাসিন্দা হয়ে গিয়েছিল। শেঠ বসাকদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সপ্তগ্রাম, হুগলী, বর্ধমান, নবদ্বীপ, যশোহর, খুলনা অঞ্চল থেকেও এসেছিলেন কলকাতার আদিবাসিন্দারা। এসময় তাদের সংস্কৃতি ছিল হিন্দু তথা বাঙালী সংস্কৃতি।

১৬৮৯ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি জমিদার সাবর্ণ চৌধুরির কাছ থেকে তিনটি গ্রাম কিনে নিয়ে চারটি অঞ্চলে ভাগ করে নেয় - ডিহি কলকাতা বা টাউন কলকাতা গোবিন্দপুর, সুতানুটি আর বাজার কলকাতা বা বড়বাজার। আজকের কুমারটুলি অঞ্চলটি সুতানুটি পরগণার অন্তর্ভুক্ত(। জানা যায় অঞ্চল সুতানুটিতে এসে এরা বসতি স্থাপন করে। ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির প(থেকে হলওয়েল হুকুম জারি করলেন দেশীয় ব্যক্তি(যারা একই পেশা অবলম্বী তাদেরকে এক জায়গায় বসবাস করতে হবে। কলকাতায় গড়ে উঠল বিভিন্ন পাড়া, ছুতোরপাড়া, কুমোর পাড়া, দরজীপাড়া, গোসাইপাড়া, পাইকপাড়া, কলুটোলা, কসাইটোলা, আহিরীটোলা প্রভৃতি। শহর বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অভিজাতের সংখ্যা বাড়তে লাগল, বাড়তে লাগল পূজা - পার্বণের ঘটাপটা। পাল - পার্বণের জন্য প্রতিমা নির্মাণ এবং মাটির জিনিসপত্র তৈরি করে মৃৎশিল্পীরা জীবিকানির্বাহ করত। প্রথম দিকে দূর থেকে আগত মৃৎশিল্পীরা কুমারটুলি অঞ্চলেই অস্থায়ীভাবে বসবাস করত। পূজাপার্বণের পর প্রতিমা চাহিদা শেষ হলে তারা বাড়ি ফিরে যেত। কৃষ(নগর বা অন্যান্য অঞ্চল থেকে তারা কুমারটুলিতে উপস্থিত হত প্রধানত গঙ্গানদী পথে নৌকাযোগে। ত্র(মে মৃৎশিল্পের চাহিদা বারোমাস যোগান দিতে তারা স্থায়ীভাবে সেখানে বসবাস শু(করল। দেখতে দেখতে স্থানটি মৃৎশিল্পের জমজমাট (ে ত্রে পরিণত হল। লোকমুখে নামকরণ হয়ে গেল কুমারটুলি।

টুলি বা টোলা শব্দটির অর্থ হল পল্লী বা পাড়া। টোলা হল অপে(াকৃত বড় পল্লী, আর টুলি হল ছোট পাড়া। কুমারটুলি কুমোরপাড়া বা কুমোরপল্লী (যেমন আহিরিটোলা, কলুটোলা)

The Bengal Consultalions -এর তথ্য থেকে জানা যায় ৭৬ বিঘা ১৪ কাঠা অঞ্চল জুড়ে কুমোরদের বসতি ছিল। এবং তা ২৫০ বছরের পুরনো। প্রায় দশ ল(টাকার শিল্পদ্রব্য ৮ মাস ধরে পোটোরা উৎপাদন করে থাকে।

মূর্তিপূজার মধ্যে সব থেকে বড় পূজা হল দুর্গাপূজা। পুরানো কলকাতার নবকৃষ(দেব এই পূজার প্রচল করেন। পুরানো কলকাতার আরো কয়েকটি বাড়িতে ঘটা করে পূজা হত। রাজা কৃষ(চন্দ্র, শোভাবাজারের রাজার বাড়ি, বাগবাজারের নন্দ বসুর বাড়ি। দরজিপাড়ায় মিত্তির, নিম তলার দত্তদের বাড়ি, পাথুরেঘাটার ঘোষেদের বাড়ি প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। দুর্গাপ্রতিমা ছাড়াও লক্ষ্মী, অন্নপূর্ণা, বি(েকর্মা, জগদ্ধাত্রী, কালী, কার্ত্তিক, সরস্বতী এবং ইদানীংকালে গঙ্গা, বনবিবি, শনি, দ(িণরায় প্রভৃতির চাহিদাও শিল্পীদের মেটাতে হয়।

মৃৎশিল্পীগোষ্ঠীর পর্যালোচনা করে বলা যায়, প্রথমে এরা বনেদী বাড়ির জন্য প্রতিমা তৈরি করতেন। সার্বজনীন পূজা ব্যাপক আকার নিলে কাজের পরিধিও বেড়ে যায়। মৃৎশিল্পীদের জাতিগত পদবী দাস, খাঁ, পাল, প্রামাণিক, পাত্র, সন্ন্যাসী, খাস, বারিক, কুণ্ডু । বর্তমানে ঘোষ ব্যানার্জ্জী, দত্ত এই পদবীধারীরাও একাজে যুক্ত(। কয়েকজন স্বনামধন্য শিল্পী হলেন, জি পাল, এন সি পাল, নিরঞ্জন পাল, শৈলেন্দ্র পাল প্রভৃতি। ছোট বড় মিলে প্রায় ১৫০ ঘর মৃৎশিল্পীর বাস। কালীঘাটের শিল্পীদের মূর্তি গড়া নিষিদ্ধ ছিল বলে এদের অনেকেই পরবর্তীকালে কুমারটুলিতে চলে আসেন। এঁরা দুর্গাপ্রতিমার পেছনে চালচিত্র সহ (পটে আঁকা) মূর্তি গড়তে পারতেন। মৃৎশিল্পীদের নিজস্ব পূজা ব্রহ্মা বিষু(

মহেশ্বরের মূর্তি অবলম্বন করেই। কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে মৃৎশিল্পীরা এখন ছড়িয়ে আছেন। গড়িয়া যাদবপুর বেলেঘাটা শালকিয়া নাগেরবাজার প্রভৃতি অঞ্চলে। এদের অনেকেই দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গ থেকেও এসেছেন। বড় ধরনের কাজ পেতে হলে খদ্দেরকে আজও কুমারটুলিতে ছুটে আসতে হয়।

বিভিন্ন পর্যায়ে মূর্তি নির্মাণের কাজটি সমাধা করতে হয়।

খড়বাঁধা - নিচে একটি পাটাতনের উপর শক্ত করে মূর্তির আকৃতি অনুযায়ী কাঠামো তৈরি করতে হয়, বাঁশকে বিভিন্ন মাপে কেটে এটি বাঁধা হয়। এরপর প্রতিমার একটি কঙ্কাল খড় ও দড়ি দিয়ে বেঁধে কাঠামোর সঙ্গে শক্ত করে আটকে দেওয়া হয়।

একমাটি - তুষ কাঠের গুড়ো ও খড় মেশানো পেটা মাটি দিয়ে কঙ্কালের ওপর মোটামুটি একটা আদল গড়ে নেওয়া হয় এসময় চালি অঞ্চল ও মাঁচার চার দিকটা এই মাটির প্রলেপ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। এরপর এটিকে কয়েকদিন রোদে শুকিয়ে নেওয়া হয়।

দুইমাটি - একমাটির পর ছাঁচে তৈরি মস্তক বসিয়ে হাত ও পায়ের আঙ্গুল বাদে প্রায় সব অঞ্চলেই বেলেমাটি দিয়ে (গঙ্গামাটি) ফুটিয়ে তোলা হয়। চালি ও মাঁচার অঞ্চলও পাতলা মাটির প্রলেপ দিয়ে মসৃণ করা হয়। সবটিকে ভাল করে শুকিয়ে নিয়ে হাত ও পায়ের আঙুল, জয়েন্টের মুখে কাপড়ের পটি, অলঙ্কার (ছাঁচের) ও চালির চারদিকটা ছাঁচের নকসায় সজ্জিত করা হয়।

রঙ করা - শুকনো করা দুইমাটির মুর্তিকে পাতলা কাপড় দিয়ে ঘষে খড়ির রঙ দু'ছোপ দেওয়া হয়। এরপর বিভিন্ন দেহের অংশে মূর্তি অনুযায়ী (সরস্বতীর সাদা, লক্ষ্মীর হলুদ, কালীর কালো) বিভিন্ন রঙ দেওয়া হয়। মিশ্র রঙের ক্ষেত্রে লাল হলুদ কালো সবুজ কমলা নীল প্রভৃতির মধ্য থেকেই মিশিয়ে তৈরি করা হয়। এরপর সূক্ষ্ম তুলি দিয়ে চক্ষু দান করা হয়। সাবুর আঠা পাতলা করে প্রতিমার দেহে মসৃণ করার জন্যে বুলিয়ে নেওয়া হয়। এরপর কাপড় পরানো হয়। মাথায়, হাতে, কোমরে অলঙ্কার আঠা দিয়ে চিটিয়ে দেওয়া হয়। সবশেষে পাট বা শনের তৈরি চুল সেঁটে দেওয়া হয়।

যেসব উপাদান লাগে সেগুলি হল খড়, তুষ, দড়ি, কাঠ, বাঁশ, তেঁতুল বিচির গুঁড়ো অ্যারা(ট, পাটের বা শনের চুল, সাজসজ্জার অলঙ্কার (শোলা ও ডাকের) প্রভৃতি। মূল উপাদান হল মাটি। একমাটি ও দোমাটির মধ্যে পার্থক্য দেখা যায় -

একমাটি - খড়, তুষ, কাঠের গুড়ো, পাঁকমাটি (কালো)

দুইমাটি - বালিমেশানো মিহি পাতলা মাটি কখনও কখনও এতে পাটের কুটো মেশানো হয়।

যে সব যন্ত্রপাতি লাগে সেগুলি হল -

বোসোয়া - দুই তিন সাইজের তৈরি ডগা ভোঁতা।

চিয়াড়ি - বাঁশের তৈরি চ্যাপ্টা ডগা সরু তুলি।

তুলি বা ব্রাশ - পূর্বে বিদেশী তুলি ব্যবহার করা হত, এখন ঘোড়ার ঘাড়ের চুলের দ্বারা তৈরি করা হয়।

তাছাড়া কাটারি, কাস্তে কাঁইচি। মাটি ছানার যন্ত্র, মুগুর প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়।

উপাদানের উৎসগুলি সংগৃহীত হয় বিভিন্ন জায়গা থেকে মাটি আসে উলুবেড়িয়া থেকে। বাঁশ ও কাঠ এগুলি স্থানীয় (বাগবাজার) পাইকারদের কাছ থেকে। খড় আসে খোড়া পোস্তা থেকে (গঙ্গার ধারে) রঙ আসে (গঙ্গার ধারে) শোভাবাজার ও নতুন বাজারের দোকান থেকে। অন্যান্য জিনিস পার্শ্ববর্তী দোকান থেকেই সংগৃহীত হয়।

আনুষঙ্গিক শিল্প - মূর্তির সঙ্গে সংযুক্ত শোলা বা গয়নার শিল্প কুমারটুলি অঞ্চলেই গড়ে উঠেছে। উল্টোডাঙ্গার কাছেই (রেল স্টেশনের কাছে) শোলার হাট বসে। এখান থেকে শোলা সংগ্রহ করে দোকানে বসেই গয়না বানায়। এদের অনেকেরই বাস কৃষ্ণনগরে ছিল। এখনো যোগাযোগ আছে। ডাকের গয়না কৃষ্ণনগর থেকেও আসে। এখনকার ডাকের সাজে ব্যবহৃত হয় শোলার কাপ, জরির অসি, বুনিয়ান, চুমকী, জামিরা, কাগজ, রাঙতা ইত্যাদি। এই অঞ্চলে ঘুরলেই দেখা যায় মাঝে মাঝে শোলার শিল্পীরা অত্যন্ত দক্ষ তার সাথে ডাকের গয়না বানিয়ে চলেছেন।

আর্থিক আনুকূল্য বলতে ব্যক্তিগত অর্থ ছাড়া ব্যাঙ্ক থেকেও ঋণ পায়। সরকারী সাহায্য বলতে পুজোর পূর্বে জরীভিত্তিতে জল ও বিদ্যুতের ব্যবস্থা এবং সাময়িক নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকে।

কুমারটুলি - কুমারটুলির মৃৎশিল্পের খ্যাতি আজ অনস্বীকার্য। বছরের দু'তিন মাস ছাড়া সারা বৎসরই কাজ চলে। জায়গার স্বল্পতা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ আর্থিক দুরবস্থায় পড়ে কিছু শিল্পী কাজ ছেড়েছে। পূজার সময়ে নিজদের বাস করার জায়গাটুকুরও অভাব ঘটে। পল্লীবাসীর সুবিধার্থে দুটি সমিতি গঠন করেছেন যারা এই অঞ্চলের শিল্পীদের সুবিধা দেখে থাকেন।

একটি স্থায়ী গ্যালারির অভাবে বিদেশীরা এসে প্রতিমা না দেখে ফিরে যান। বয়স্ক শিল্পীরা বড় কাজ ছেড়ে ছাঁচের ও পোড়ামাটির কাজ করে থাকেন। খদ্দেরের পছন্দমাফিক মূর্তি গড়তে গিয়ে সাবেকী ধরণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও পাল্টাতে হয়। মডেলিং প্লাস্টার, ব্রোঞ্জ, প্রস্তর, গ্লাস - ফাইবার প্রভৃতির শিল্পীরাও এই অঞ্চলেই বসবাস করেন।

এদের মতে প্রতিমা শিল্প একমাত্র অবলম্বন হওয়ায় (তির অংশ দিন দিনই বাড়ছে। পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে এই শিল্পকে ধরে রাখার প্রবণতা তাই দিন দিন কমছে।

আজকাল পূজা মণ্ডপে যে বিভিন্ন ধরনের প্রতিমা দেখি তার একটা ইতিহাস আছে। পূর্বে এক চালচিত্রের মধ্যে দুর্গাপ্রতিমা তৈরী হত। যার পটলচেরা চোখ। চোখের দৃষ্টি কোমল। হাতের মুষ্টি বজ্র। দেশজ (চি। একটি মার্জিত বোধে স্থির ছিল। দেবীর কাঞ্চন কিংবা অতসী রঙ অশিল্পসম্মত হত না। বারোয়ারি মূর্তিতে প্রতিমাগুলিকে চালিথেকে বিচ্ছিন্ন করা হল। থুতনিটা হল গোল। চোখটা পুঁটি মাছের মতো। এরও পরে এল আর্টের ঠাকুর। ভারতের বিভিন্ন মন্দিরের আদলে। দেশের স্বনামধন্য শিল্পীরাও মাঝে মাঝে মূর্তি গড়েছেন। নীরদ মজুমদার, চিন্তামণি কর, রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, রথীন মৈত্র, সানু লাহিড়ী, বিকাশ ভট্টাচার্য প্রমুখ। কিন্তু কুমারটুলির শিল্পীদের সঙ্গে অনেকগুলি মূর্তি গড়ে ও যৌথকাজের দ্বারা লোকশিল্পের মেজাজ এঁরা আজো এরা ধরে রেখেছেন। বৈচিত্র্যপূর্ণ মূর্তি বলতে এঁরা বলে থাকেন বুদ্ধ মূর্তি, বাংলা মূর্তি, ওরিয়েন্টাল (অজন্তা, ইলোরা) মীরাবাঈ প্রভৃতি মূর্তির কথা।

মূর্তির সাইজ ও সাজসজ্জা অনুযায়ী দাম নির্ধারিত হয়। ইদানীং অবশ্য পরিশ্রম ও মানের দিকটাও বিচার করা হয়। একটি দুর্গা প্রতিমা এক হাজার থেকে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত দাম হতে পারে। সরস্বতী, কালী, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতির মূল্য কাজ অনুযায়ী দেড়শত থেকে শ'শত টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে। অনেক সময় মাটির কাজ চলতে চলতে খরিদ্দার এসে ঠাকুর নির্বাচন ও বায়না দিয়ে যান। শিল্পীরা নিজেদের সুবিধার জন্য ছক কেটে দাম নির্ধারণ করেন।

(আকাডেমি অব ফোকালোরে 'লোকসংস্কৃতি' বিষয়ে ডিপ্লোমা কোর্সের সমীক্ষাপত্র/ ১৯৯২)

সূত্র ঃ-

১। বিশ্বভারতী পত্রিকা - বর্ষ ২৯, সংখ্যা ৪, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮৪।

২। স্মরণিকা কুমারটুলি মৃৎশিল্প সংস্কৃতি সমিতি, ৩য় শিল্প প্রদর্শণী, ১৯৯১।

৩। লোকশ্রুতি - সপ্তম সংখ্যা, ১৯৯০।

৪। ঐ অষ্ট সংখ্যা, ১৯৯১।

৫। Handicrafts of West Bengal – Ashish Basu

৬। বাংলার লোকসংস্কৃতি সমাজতত্ত্ব - বিনয় ঘোষ।

৭। Indian Folk Arts and Crafts – Jasleen Dhamija

৮। দৈনিক বসুমতী - ১৩৯১, বিশ্বের সংখ্যা।

৯। পুতুলের ইতিহাস - সায়ক, পল্লব সেনগুপ্ত
১০। কৃষ(নগরের মৃৎশিল্প ও শিল্পী সমাজ - সুধীর চত্র(বর্তী।
১১। কলকাতা পুরশ্রী - ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪।